SUṢAMĀ : Multidisciplinary Research Journal ISSN: 3107-4529
(International Peer-Reviewed & Refereed Journal)
Vol. 1, Issue-4, (Oct-Dec) 2025

ন্যায়মতে জীবাত্মার বহুত্ব প্রতিপাদন: একটি সমীক্ষা

Biswajit Mondal
Ph.D. Scholar, Dept. of Philosophy
Jadavpur University, Jadavpur, West Bengal, India
Email: Biswajit.mondalju@gmail.com

Abstract: আমাদের ভারতীয় দর্শনে দার্শনিকদের মধ্যে যতো না তাদের মধ্যে মতৈক্য আছে তার থেকে বেশি মতানৈক্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন— প্রমাণ, পদার্থ প্রভৃতি বহুবিধ বিষয়ে মতানৈক্য লক্ষ্য করা যায়। সেরকমই একটি বিবাদমান বিষয় হল— আত্মা। আত্মার স্বরূপ বিষয়ে ভারতীয় দার্শনিকদের মধ্যে বিবিধ মত লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ তাঁদের মধ্যে আত্মার স্বরূপ বিষয়ে মতানৈক্য তো আছেই, একই রূপে আত্মার সংখ্যা বিষয়েও মতবৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে আত্মার সংখ্যা বিষয়ে দার্শনিকদের মধ্যে মূলতঃ যে মতবিরোধ দেখা যায় তা হল- আত্মার একত্ববাদিগণের মতে যেমন আত্মা হল এক। তেমনি আবার আত্মার বহুত্ববাদীগণের মতে আত্মা বহু। আমি মূলতঃ এস্থলে কারা আত্মাকে বহু বলেন এবং কেনই বা আত্মাকে বহু বলেন তার পশ্চাতে যুক্তি কি? সেই বিষয়ে একটা উপস্থাপনা করার চেষ্টা করবো।

Keywords: আত্মা, জীব, জীবাত্মা, বহুত্ব, ন্যায় সম্প্রদায়।

প্রস্তাবনা: বেদানুগত অদ্বৈতি সম্প্রদায় মূলতঃ একপ্রকার আত্মা স্বীকার করেন। কিন্তু নৈয়ায়িক সম্প্রদায় বেদানুসারী হয়েও তাঁরা প্রধানত দুই প্রকার আত্মা স্বীকার করেন। পরমাত্মা ও জীবাত্মা। তাঁদের মতে পরমাত্মা এক হলেও জীবাত্মা বহু। এ স্থলে যে প্রশ্ন ওঠে সেটি হল— এইরূপ পরমাত্মা ও জীবাত্মা দু'প্রকার আত্মা কেন স্বীকার করেছেন? এবং বিশেষ করে পরমাত্মা স্বীকারের প্রয়োজনীয়তা কী? আর মূল যে বিষয় নিয়ে বিবাদ লক্ষ্য করা যায় তা হল বহু জীবাত্মা স্বীকারের প্রয়োজনীয়তাই বা কী? এই বহু জীবাত্মা স্বীকার না করা হলে তাঁদের (নৈয়ায়িকদের) দর্শনে কি সমস্যা দেখা দেবে? অর্থাৎ কেনই বা তারা বহু জীবাত্মা স্বীকার করতে বাধ্য হবেন? তার পশ্চাতে কি যুক্তি তাঁরা প্রদর্শন করেন? তা আমি শোধপত্রে প্রদর্শন করার চেষ্টা করবো।

এ স্থলে আত্মা তথা জীবাত্মার ব্যুৎপত্তি নিদর্শন পূর্বক এই বিশেষ আলোচনা আমি আমার শোধপত্রে নিম্নরূপে উপস্থাপন করছি।

'অৎ' ধাতুর উত্তর 'মনিন্'[1] সূত্র প্রত্যয় যোগে আত্মা শব্দটি সিদ্ধ হয়েছে। 'অৎ' ধাতুর অর্থ হল নিরন্তর গমন বা অবিরাম ভাবে চলা। অর্থাৎ এর মাধ্যমে স্বয়ম্, আত্মা, ব্রহ্মা ইত্যাদিকে বোঝানো হয়েছে। আর 'জীব্' ধাতুর উত্তর 'অচ্'[2] সূত্র প্রত্যয় যোগে জীব শব্দটি সিদ্ধ হয়েছে। 'জীব্' ধাতুর অর্থ হল প্রাণ ধারণ। অর্থাৎ প্রাণ আছে এমন সেটি মনুষ্য এবং মনুষ্যেতর সকল প্রাণ বিশিষ্টকেই জীব বোঝায়। আর এই জীব এবং আত্মা শব্দ দুটিকে সমাসবদ্ধ করলে জীবাত্মা শব্দটি পাওয়া যায়। যার অর্থ হলো নিরন্তর গতি সহকৃত রূপে যে বা যিনি প্রাণ ধারণ করে থাকেন।

ন্যায় দর্শনে আত্মার দুটি প্রকার স্বীকার করা হয়। যা হল জীবাত্মা ও পরমাত্মা, যেখানে বলা হয় জীবাত্মা ভিন্ন ভিন্ন জীবদেহে ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় তা বহু। কিন্তু পরমাত্মা এক। কিন্তু এখন প্রশ্ন হল আত্মার এভাবে দুটি প্রকার কেন স্বীকার করতে হল? অর্থাৎ যদি একই প্রকার আত্মা শুধুমাত্র জীবাত্মা স্বীকার করা হত তাহলে ন্যায় দর্শনে কী সমস্যা হত? নৈয়ায়িকগণ উক্ত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করার চেষ্টা করেন এভাবে যে, যদি আত্মা এক প্রকারের হত তাহলে এই যে সৃষ্ট জগৎ এবং জীবন তার ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হত না। অর্থাৎ মূলত সৃষ্টির ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য এই জগতের সৃষ্টির আদিতে যে একজন নিমিত্ত কারণের প্রয়োজন, সেই নিমিত্ত কারণ ছাড়া এই কার্য-জগৎ উৎপন্ন হতে পারে না। যেমন একটি কার্য ঘটও উৎপন্ন হতে পারে না। একটি কার্য ঘট

উৎপন্ন হওয়ার জন্য কুম্ভকার নামক নিমিত্ত কারণের প্রয়োজন। যতই উপাদান কারণ থাকুক না কেন নিমিত্ত কারণ (কর্তা) ছাড়া কোনও কার্যই উৎপন্ন হতে পারে না। ফলত এই জগৎ কার্য হওয়ায় তা উৎপন্ন হওয়ায় উপাদান কারণ পরমাণু সমূহ থাকলেও একজন নিমিত্ত কারণের প্রয়োজন। আর তিনি হলেন পরমাত্মা বা ঈশ্বর। ন্যায়দর্শনে এই ঈশ্বর বা পরমাত্মাকে বেদের স্রষ্টা হিসাবে মনে করা হয়। যিনি বেদের রচয়িতা, যিনি এই কার্য-জগতের কর্তা। সকল জীবের সৃষ্টি কর্তা এবং সকল জীবের নিজ নিজ কর্ম অনুসারে কর্মফলের অধিষ্ঠাতা।

পুনরায় কেউ এমন প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারেন যে, ন্যায়দর্শন তো আস্তিক সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হওয়ায় নৈয়ায়িকগণ অবশ্যই শ্রুতির অনুগামী হবেন। অর্থাৎ শ্রুতি প্রমাণে বিশ্বাসী হবেন বা আস্থা রাখবেন। যেখানে বেদের প্রামাণ্য রক্ষা করা নৈয়ায়িকগণের প্রধান কাজ হওয়া উচিৎ। সেখানে তাঁরা বেদের প্রামাণ্য রক্ষা করা তো দূরে থাক, বেদ (শ্রুতি) প্রমাণকে অস্বীকার করেন কীভাবে?

এভাবে নৈয়ায়িকগণের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপনের তাৎপর্য হল অদ্বৈত বেদান্তিগণও শ্রুতির অনুগামী আস্তিক সম্প্রদায়, তাঁরা এমন কিছু *উপনিষদ্* বাক্য উদ্ধৃত করেন যার দ্বারা কোনওভাবেই আত্মার দ্বিত্ব এমনকি জীবাত্মার বহুত্ব কোনকিছুই সিদ্ধ হয় না, বরং আত্মার একত্বই প্রতিপাদিত হয়। যদি আমরা মহাবাক্যগুলি দেখি 'তত্ত্বমসি'[3] অর্থাৎ 'তুমিই সেই', আবার 'অহং ব্রহ্মাস্মি'[4] এই স্থলে বলা হয় 'আমিই ব্রহ্ম' ইত্যাদি মহাবাক্যগুলির দ্বারা কোনওরূপে জীবাত্মার বহুত্ব প্রমাণিত হয় না, আত্মার অদ্বৈতত্বই প্রতিপন্ন হয়।

উক্তরূপ আপত্তির উত্তরে নৈয়ায়িকগণ বলেন উপরিউক্ত বেদের মহাবাক্যগুলির সাহায্যে জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ কোন তত্ত্ব প্রতিপাদিত হয়নি। নৈয়ায়িকগণ মনে করেন প্রকৃতপক্ষে ঐ সকল মহাবাক্যের তাৎপর্য হল জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ জ্ঞানে ধ্যান করলে বা উপাসনা করলে চিত্তশুদ্ধি হয়, যা মুক্তির পথ প্রশস্ত বা সুগম করে। আর একারণেই শ্রুতিতে উক্তরূপ অভেদ উপদেশ প্রদান করা হয়েছে। বাস্তবে জীব ও পরমাত্মা অভিন্ন নয়, কারণ যে সকল পদার্থ বহু তা এক ও অদ্বৈত পদার্থ হবে কীরূপে? অতএব মহাবাক্য গুলির তাৎপর্য হল উপাসনায়। এস্থলে নৈয়ায়িকগণ যা বলেন জীব ও পরমাত্মা (ব্রহ্মের) ভেদ থাকলেও যিনি সাধক তিনি নিজ আত্মাতে ব্রহ্মরূপ অভেদত্ব আরোপিত করেই 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এইরূপ চিন্তা করেন। এতে রাগ-দ্বেষাদি দূরীভূত হয়। যা সাধককে মোক্ষের পথে অগ্রসর করে বা এগিয়ে নিয়ে যায়।

এছাড়াও ন্যায় দর্শনের প্রণেতা মহর্ষি গৌতম ন্যায় দর্শন গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের দশম সূত্রে বলেছেন-"ইচ্ছা-দ্বেষ-প্রযত্ন-সুখ-দুঃখ-জ্ঞানান্যত্মনো লিঙ্গম্"[5]। যেখানে ইচ্ছা, দ্বেষ প্রভৃতিকে জীবাত্মার অনুমাপক বলেছেন। এখন জীবাত্মার অনুমাপক যে ইচ্ছাদি তা এককালে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। যার দ্বারা প্রতি ব্যক্তির শরীরে জীবাত্মা যে ভিন্ন ভিন্ন বা বহু তা প্রমাণিত হয়।

ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন আবার "ইন্দ্রিয়ান্তরবিকারাৎ"[6] এই সূত্রের ভাষ্য রচনা করতে গিয়ে বলেন "নান্যদৃষ্টমন্যঃ স্মরতি"[7]। যার অর্থ হল এক ব্যক্তি অন্যের দৃষ্ট বিষয় স্মরণ করতে পারেন না। এই স্মরণের বহুত্বের দ্বারাও জীবাত্মার বহুত্ব প্রমাণিত হয়। কারণ প্রতি ব্যক্তির অনুভবের বিষয় ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় স্মরণের বিষয়গুলিও ভিন্ন ভিন্ন হয়। ফলে একজনের বিষয় অন্যজন স্মরণ করতে পারেন না। সুতরাং এর দ্বারা প্রমাণিত হয় সেই সেই বিষয়গুলির গ্রহণের কর্তাও ভিন্ন ভিন্ন।

ন্যায়দর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের চতুর্থ সূত্র "শরীরদাহে পাতকাভাবাৎ"[8]। যেখানে বলা হয় কেউ প্রাণিহত্যা করলে পাপ হয়। অর্থাৎ প্রাণিহিংসা জন্য পাপের কথা নির্দেশিত হয় এই সূত্রে। কিন্তু এখন যদি আমরা প্রতি ব্যক্তিতে ভিন্ন ভিন্ন আত্মা স্বীকার না করে একটিই আত্মা স্বীকার করে থাকি, তবে সেক্ষেত্রে দেখতে পাব কোনও একজন ব্যক্তি যদি এই প্রাণিহিংসা করে তবে, সেক্ষেত্রে যে পাপ উৎপন্ন হয় তা সকলের ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত হবে। অর্থাৎ একজন

প্রাণিহিংসা করলে সকলকে প্রাণিহিংসা জন্য পাপে লিপ্ত হতে হবে।

একইরূপে দর্শন, স্পর্শনাদি অনুভবের পরে আমাদের যে প্রত্যভিজ্ঞা হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে যদি ঐ প্রত্যভিজ্ঞার কর্তা একই হয়ে থাকে অর্থাৎ আত্মা এক হয়ে থাকে, তবে কোনও একজন ব্যক্তির অনুভবের পরে যে প্রত্যভিজ্ঞা উৎপন্ন হবে তা শুধুমাত্র ঐ ব্যক্তিরই হবে না সকল ব্যক্তির ক্ষেত্রেই ঐ প্রত্যভিজ্ঞার প্রসঙ্গ এসে পড়বে। বস্তুতপক্ষে আমরা তা দেখি না, আমরা যা দেখি তা হল প্রতিব্যক্তির নিজ নিজ অনুভবের বিষয় নিয়মমাফিক প্রত্যভিজ্ঞাত হয় ভিন্ন ভিন্ন রূপে। কোনও একজন ব্যক্তির অনুভবের বিষয় সকলের কাছে প্রত্যভিজ্ঞাত হয় না। এর দ্বারাই প্রমাণিত হয় আত্মা প্রতি শরীরে ভিন্ন ভিন্ন বা বহু।

আবার আমরা দেখি, "নিয়মানিয়মৌ তু তদ্বিশেষকৌ"[9] এই সূত্রের ভাষ্যে বাৎস্যায়ন বলেন "যথা নানাশরীরেষু নানাজ্ঞাতারো বুদ্ধ্যাদিগুণব্যস্থানাৎ"[10] যেখানে বলা হয় এক শরীরে ভিন্ন ভিন্ন বা বহু জ্ঞাতা বা আত্মা না থাকলেও বুদ্ধি প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকায় ভিন্ন ভিন্ন শরীরে ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞাতা সিদ্ধ হয়। সুতরাং এর দ্বারা আমরা সহজেই অনুধাবন করতে পারি ন্যায়দর্শনে শরীরভেদে স্বতন্ত্র বা পৃথক পৃথক জীবাত্মা স্বীকৃত হয়েছে। কোনও পূর্বপক্ষী যদি এমন আপত্তি তোলেন যে, প্রত্যেকের শরীরে সুখ-দুঃখ এবং জ্ঞানের উৎপত্তি একই প্রকারে হয়ে থাকে অর্থাৎ সমান নিয়মের অধীন। ফলে এর থেকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, সকল শরীরে আত্মা এক ও অভিন্ন।

এরূপ বলা হলে জীবাত্মার বহুত্ববাদী ন্যায়-বৈশেষিকগণ বলবেন সকল শরীরে আত্মা এক হলে কেউ ধনী, কেউ বা দরিদ্র আবার কেউ বিদ্বান কেউ মূর্খ এই যে, বৈষম্য তার ব্যাখ্যা প্রদান করা সম্ভব হবে না। এই কারণে প্রতি ব্যক্তিতে উক্তরূপ বৈচিত্র্যবশত জীবাত্মার বহুত্বই সিদ্ধ হয়। এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলে কোনও একত্ববাদী যদি এমন বলেন যে বালক, যুবক এবং বার্ধক্য ভেদে একই আত্মার যেমন বৈচিত্র্য বা বৈষম্য লক্ষ্য করি, তেমনি দেহ ভেদেও প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে বৈচিত্র্য লক্ষ্য করি। উত্তরে নৈয়ায়িকগণ বলবেন এমন বলা ঠিক হবে না, কারণ বাল্যাদিকাল ভেদে দেহ ভেদ বা দেহ ভিন্ন হলেও বস্তুতপক্ষে ঐ একই দেহের কালের ভেদ বশত আত্মার ভেদ হয় না, আত্মা একই থাকে। কিন্তু পূর্বের কর্মফল ভোগের জন্য অদৃষ্টবশত যে জন্ম সেই জন্মভেদে পুনরায় কোনও আত্মা দেহ ধারণ করলেও একই সময়ে আমরা যে বিচিত্র বৈশিষ্ট্যযুক্ত ব্যক্তি লক্ষ্য করি তা বহু আত্মার কারণেই সম্ভব হয়।

এছাড়াও আমরা জীবাত্মার বহুত্বের প্রমাণ পাই বিভিন্ন *উপনিষদ্* বাক্যে। যেমন *কঠোপনিষদ্* এ পাই "নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্"[11] যেখানে বলা হয় সমস্ত অনিত্য পদার্থের মধ্যে যিনি নিত্য, সমস্ত চেতনের চৈতন্যের যিনি সম্পাদক, যিনি এক হয়েও বহু জীবের কর্মফল প্রদান করেন। এই *উপনিষদ্* বাক্যটি যদি আমরা ভালোভাবে অনুধাবন করি তবে এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাব দু'প্রকার আত্মারই বিশেষ বৈশিষ্ট্য নির্দেশিত হয়েছে। যেখানে বলা হচ্ছে যে, পরমাত্মা যিনি তিনি সকল দেহধারণকারী জীবাত্মার চৈতন্যের সম্পাদন করেন, আবার সকল জীবের কর্মের ফলও প্রদান করে থাকেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে এই শ্রুতির দ্বারা একদিকে যেমন পরমাত্মার একত্ব প্রতিপাদিত হয়েছে, তেমনি অপরদিকে জীবাত্মার বহুত্বই নির্দেশিত হয়েছে।

বস্তুতপক্ষে জীবাত্মার বহুত্ব যদি স্বীকার না করা হয়, তাহলে আত্মা এক হওয়ায় প্রতিটি দেহেই ঐ একই আত্মাকে অবস্থান করতে হবে, আর তা যদি হয় তাহলে একজনের জন্ম বা মৃত্যুতে সকলেরই জন্ম বা মৃত্যুর প্রসঙ্গ এসে পড়বে। কেউ একজন অন্ধ হলেই সকলেরই অন্ধত্বের প্রসঙ্গ দেখা যাবে। আত্মা এক হলে কেউ একজন চলতে শুরু করলে সকলকে চলতে হবে। আবার সেই আত্মা যদি ঘুমিয়ে পড়ে, তাহলে কেউ আর জেগে থাকতে পারবে না। কিন্তু আমরা বাস্তবে তা দেখি না, বরং বিপরীত ঘটনা সমূহ ঘটতে দেখি। কোনও একজনের জন্ম বা মৃত্যুতে সকলের জন্ম বা মৃত্যু হয় না। একজন চলতে শুরু করলেও বাকি সকলকে আমরা চলতে দেখি না। একজন

ঘুমালেও অন্যদেরকে জেগে থাকতে দেখি। তাছাড়াও প্রতিটি ব্যক্তির স্বভাবের মধ্যেও কত পার্থক্য দেখি। অর্থাৎ প্রত্যকের নিজের নিজের কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্যও লক্ষ্য করি। সকল দেহে যদি উক্তরূপ একই আত্মা অবস্থান করত, তাহলে একই সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির কাজ-কর্ম এবং স্বভাবের যে বৈচিত্র্য তা ঘটত না। আর প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে উক্তরূপ স্বভাবের বা বৈশিষ্ট্যের বিভিন্নতার জন্য আত্মার একত্ব নয়, বরং জীবাত্মার বহুত্বই স্বীকার করতে হয়।

আর এই এক আত্মা প্রতিটি ভিন্ন ভিন্ন শরীরে অবস্থান করলে জন্ম, মৃত্যুর ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু নৈয়ায়িকগণ যেরূপ প্রতিটি ভিন্ন ভিন্ন শরীরে পৃথকরূপে ভিন্ন ভিন্ন আত্মা (জীবাত্মা) স্বীকার করেন, তার সাহায্যে সহজেই জীবের জন্ম-মৃত্যুর ব্যাখ্যা প্রদান করা সম্ভব হয়। এরূপ বলা হলে আত্মার একত্ববাদিগণ বলেন দেহরূপ উপাধিভেদের দ্বারা পূর্বোক্তরূপ জন্ম-মৃত্যুর ব্যাখ্যা সম্ভব।

ঐ যুক্তি যে অসিদ্ধ তা বোঝাতে গিয়ে আত্মার বহুত্ববাদিগণ বলেন প্রকৃতপক্ষে আত্মা যদি এক হয়, তাহলে দেহরূপ উপাধিভেদের দ্বারাও জন্ম-মৃত্যুর ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হবে না। কারণ, সেক্ষেত্রে হস্ত, পদ, স্তন প্রভৃতির উপাধিভেদেও জন্ম-মৃত্যুর প্রসঙ্গ এসে পড়বে। কিন্তু আমরা দেখি প্রকৃতপক্ষে দেহাবয়বের উৎপত্তি বা নাশে জন্মমৃত্যু প্রভাবিত হয় না। অর্থাৎ কেউ আমাদের হাত-পা কেটে দিলে যেমন আমাদের মৃত্যু হয় না, আবার তেমনি কোনও যুবতির স্তন প্রভৃতির উৎপত্তিতেও ঐ যুবতির জন্ম হয় না। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি এক আত্মা প্রতি শরীরে অবস্থান করলে জন্মমৃত্যুর ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। ফলত বহুত্ববাদী নৈয়ায়িকগণ যেরূপ প্রতিটি শরীরে ভিন্ন ভিন্ন আত্মা স্বীকার করেন তার দ্বারা সহজেই এই জন্ম-মৃত্যুর ব্যাখ্যা সম্ভব। তাছাড়াও জীবাত্মার বহুত্ব প্রতিপাদক শ্রুতিও বর্তমান থাকায় জীবাত্মার একত্ববাদ যুক্তিযুক্ত হতে পারে না। যা হল "য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্ত্যথেতরে দুঃখমেবাপিষন্তি"[12] যার অর্থ হল যাঁরা এই পরম তত্ত্বকে জানেন তাঁরা অমৃতত্ব লাভ করেন এবং তদ্ভিন্ন বাকি সকলেই শুধু দঃখ পান। এই স্থলে এই যে 'যাঁরা' বলতে জীবাত্মার বহুত্বকেই বোঝানো হয়েছে। ফলতঃ জীবাত্মার বহুত্ববাদ গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত হবে।

কেউ এরূপ আপত্তি উত্থাপন করতে পারেন যে, আত্মার একত্ব প্রতিপাদক শ্রুতিও তো আছে। যা হল "মনসৈবানুদ্রষ্টবং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।

মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।।"[13]

অর্থাৎ *বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ এ* বলা হয়েছে, সেই ব্রহ্মকে পরিশুদ্ধ মনের দ্বারা দেখতে হবে। এই ব্রহ্মে বিভক্ত কিছুই নেই, যে ব্যক্তি ব্রহ্মের ভেদ কল্পনা করেন বা ব্রহ্মের ভেদবাদী মত গ্রহণ করেন সে মৃত্যুর পরেও মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। ফলত আমরা দেখি পরস্পর বিরুদ্ধ দুটি শ্রুতি। আর এই রূপে দুটি শ্রুতির মধ্যে বিরোধ হলে কোন শ্রুতিটি গ্রহণীয় আর কোনটি গ্রহণীয় নয় তা আমরা জানি না, যে কারণে এইস্থলে সংশয় উপস্থিত হয়। এরূপ হলে আত্মার একত্ববাদী কেউ বলতেই পারেন আত্মার বহুত্ব কল্পনা করা শ্রুতিবিরুদ্ধ।

উত্তরে জীবাত্মার বহুত্ববাদিগণ বলেন জীবাত্মার বহুত্ব কল্পনা শ্রুতিবিরুদ্ধ নয়, কারণ শ্রুতিতে এক পরমাত্মার কথা নির্দেশিত হলেও জীবের (জীবাত্মার) বহুত্বের কথা বিভিন্ন শ্রুতিতে স্পষ্ট আকারে উল্লিখিত হয়েছে। যা আমরা *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও* দেখি—

"অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং, বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ।

অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে, জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ।।"[14]

অর্থাৎ রজ, সত্ত্ব ও তমোগুণ বিশিষ্ট এক অজা বা জন্মরহিত নিজের অনুরূপ বহু প্রজার সৃষ্টি করেন এবং সেই এক অজা বা জন্মরহিতকে অন্য অজ বা বদ্ধজীব সকল (জীবাত্মা) ভোগ করেন। আর অপর ঐ অজ বা জীবাত্মা সকলের মধ্যে যাঁর ভোগ শেষ হয়, সে বিষয়ের প্রতি আসক্তি ত্যাগ পূর্বক মুক্তরূপে অবস্থান করেন। এই শ্রুতিতে স্পষ্টতই এক পরমাত্মা ও বহু জীবাত্মার নির্দেশ

প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও পূর্বেই *কঠোউপনিষদ্* বাক্য উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে "নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্"[15] যেখানে 'বহূনাম্' শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে যা বহুত্বকেই নির্দেশ করে। ফলত জীবাত্মার বহুত্ব নির্দেশক উক্ত শ্রুতির সাহায্যে আমরা এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি যে, জীবাত্মার বহুত্ব কোনও ভাবেই শ্রুতিবিরুদ্ধ তো নয়ই, বরং শ্রুতির অনুগামী।

অতএব পূর্বোক্তরূপ সকল প্রকার আলোচনা থেকে আমরা এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, একদিকে যেমন আত্মার একত্ব প্রতিপাদক শ্রুতি আছে, অপর দিকে তেমন আত্মার বহুত্ব প্রতিপাদক শ্রুতিও আছে। আর ঐ সকল শ্রুতি একে অপরের বিরোধী একেবারেই নয়। এইস্থলে বক্তব্য হল আত্মার বহুত্ব প্রতিপাদক শ্রুতি ও প্রমাণাদি থাকায়, আত্মার একত্ব প্রতিপাদক শ্রুতি জীবাত্মার একত্ব সম্পাদন করতে পারে না। ঐ একত্ব প্রতিপাদক শ্রুতি সমূহ পরমাত্মাকেই নির্দেশ করে। ফলে অদ্বৈতিগণ অদ্বৈত শ্রুতি উদ্ধৃত করে যেরূপ আপত্তি তোলেন নৈয়ায়িকগণের বিরুদ্ধে যে, ন্যায়দর্শনের যেরূপ সিদ্ধান্ত জীবাত্মা বহু তা শ্রুতির সাথে বিরোধী। এই আপত্তি আর নৈয়ায়িকগণের বিরুদ্ধে উঠতে পারে না, যেহেতু তাঁরা একত্ব প্রতিপাদক শ্রুতিসমূহকে জীবাত্মার নির্দেশকরূপে পরিগণিত করেন না, তাঁরা বলেন একত্ব প্রতিপাদক শ্রুতি সমূহ পরমাত্মাকেই নির্দেশ করে এবং বহুত্ব প্রতিপাদক শ্রুতি জীবাত্মাকেই নির্দেশ করে।

আর তাছাড়া এই বহু জীব স্বীকার না করা হলে আমাদের এই যে জাগতিক ব্যবহারাদী তার সিদ্ধ হবে না। কাউকে কোনও কর্ম প্রভৃতির যে নির্দেশ প্রদান করা হয় তা আর সিদ্ধ হবেনা। যদি জীবাত্মার বহুত্ব না স্বীকার করা হয় না স্বীকার করা হয়।

সংস্কৃতে একটি বিশিষ্ট প্রবাদ লক্ষ্য করা যায় যা হলো— "বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়"- অর্থাৎ অনেকের উপকারেই অনেকের সুখ। এমন বাণী গৌতম বুদ্ধের দর্শনেও পাওয়া যায়। যা ভারত সেবাশ্রম সংঘের নীতিবাক্য বলেও বিবেচিত। জীবাত্মা বহু হলেই এমন বাক্যসমূহ অর্থপূর্ণ হয়। সুতরাং ন্যায় সম্প্রদায়ের এই যে জীবাত্মার বহুত্ব স্বীকার তা যথেষ্ট যুক্তিপূর্ণ বলে আমার মনে হয়।

Endnotes

1. আতো মনিন্‌কনিব্বনিপশ্চ, *অষ্টাধ্যায়ী, সূত্র- ৩.২.৭৫*
2. *নন্দিগ্রহি....., ঐ- ১৩৪।*
3. *ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৬/৮/৭*
4. *বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ১/৪/১০*
5. *ন্যায়সূত্র, ১/১/১০*
6. *ন্যায়সূত্র, ৩/১/১২*
7. *ন্যায়সূত্র ভাষ্য, ৩/১/১২*
8. *ন্যায়সূত্র, ৩/১/৪*
9. *ন্যায়সূত্র, ৩/২/৩৭*
10. *ন্যায়সূত্র ভাষ্য, ৩/২/৩৭*
11. *কঠোপনিষদ্, ২/২/১৩*
12. *বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ৪/৪/১৪*
13. *বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ৪/৪/১৯*
14. *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্, ৪/৫*
15. *কঠোপনিষদ্, ২/২/১৩*

Bibliography

- *উপনিষদ্*। সম্পা. অতুল চন্দ্র সেন, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ ও মহেশচন্দ্র ঘোষ। কলকাতা : হরফ প্রকাশনী, ২০১৮।
- *গৌতম। ন্যায় দর্শন (প্রথম খণ্ড)। সম্পা.* ফণিভূষণ তর্কবাগীশ। কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ,

জানুয়ারী ২০১৮/বি (ষষ্ঠ প্রকাশ)।

- *গৌতম। ন্যায় দর্শন (তৃতীয় খণ্ড)। সম্পা.* ফণিভূষণ তর্কবাগীশ। কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, জানুয়ারী ২০১৭/এ (তৃতীয় পর্ষৎ মুদ্রণ)।
- ফণিভূষণ। *ন্যায় পরিচয়।* কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০৬/বি।
- ত্রিপাঠী। দীননাথ। *উদয়নাচার্য-কৃত আত্মতত্ত্ববিবেক (১ম খণ্ড)।* কলিকাতা : সংস্কৃত কলেজ, ১৯৮৪।
- পাণিনি। *অষ্টাধ্যায়ী*। সম্পা. তপন শঙ্কর ভট্টাচার্য্য। কলকাতা : সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০১৭(তৃতীয় সংস্করণ।
- বিশ্বরূপানন্দ। *বেদান্তদর্শনম্।* সম্পা. চিদ্‌ঘনানন্দ পুরী এবং আনন্দ ঝা। কলকাতা : উদ্বোধন কার্যালয়, পৌষ ১৪০২।
- ভট্টাচার্য। তারাপদ। *ন্যায়দর্শন মতে আত্মা।* কলিকাতা : সংস্কৃত কলেজ, ১৯৬৭।
- Dravid, N. S, *Atmatattvaviveka by Udayanācārya: with translation, explanation and analytical-critical survey,* Rastrapati Nivas, Shimla, Indian Institute of Advanced Study, 1995.
- Thakur, Anantalal, *Nyāyabhāṣyavārttika of Bhāradvāja Uddyotakara,* Anantalal Thakur (ed.), New Delhi, Indian Council of Philosophical Research, 1997.

———